মার্কসবাদী দৃষ্টিতে
র বী ন্দ্র কা ব্য

সতেন্দ্রনাথ সাহা

সুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

গ্রন্থকারের নিবেদন

আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছিলেন যে তিনি 'নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা'। কবির এ-বক্তব্য কেউ খণ্ডন করেননি, খণ্ডন করতে চানওনি। মালা বলেই অনেক ফুল—তাদের গন্ধ এক নয়, তাদের বর্ণও এক নয়। পার্থক্য শুধু ফুলের গন্ধে বা বর্ণে নয়। প্রতিটি ফুলকে সবাই চেনেননি, চিনলেও প্রতি ফুলের বর্ণ বা গন্ধ এক বলে প্রতিভাত হয়নি সকলের মনে। ফুল নানা, কিন্তু মালা একটা। সব ফুলকে গেঁথে তোলা হয়েছে একটা সুতোতে। সেই সুতোটা কী? সুতো কি সত্যিই একটা আছে? না থাকলে সুতোটাকে নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক তোলার কোনো প্রয়োজন থাকে না। নানা রবীন্দ্রনাথের মালার সুতো আর সুতোতে গাঁথা বিচিত্র ফুলের উপর বিতর্ক উঠবে, ওঠাটাই স্বাভাবিক।

বিতর্কই চর্চা। রবীন্দ্রচর্চার কথা যখন বলি তখন সে চর্চা এ বিতর্ককে নিয়ে, তাকে বাদ দিয়ে নয়। রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা সমালোচনা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে রবীন্দ্রচর্চা তার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটা এ-বঙ্গের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, ও-বঙ্গ সম্পর্কেও ততখানি সত্য। আধুনিক বিশ্ব রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নিস্পৃহ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে রবীন্দ্র অনুরাগের আর একটা ঢেউ বিশ্ববাসীর চিত্তকে নাড়া দেবে না আর একবার। দুঃখের হলেও অনস্বীকার্য যে বঙ্গের বাইরে ভারত ভূখণ্ডে রবীন্দ্রনাথকে চেনাবার খুব একটা বড়ো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ভারতবাসীর কাছেই আমরা পৌঁছে দিতে পারলাম না রবীন্দ্রনাথকে। এর পেছনে অনেক কারণ আছে, রাজনৈতিক কারণও আছে। এটা আক্ষেপের বিষয়, কিন্তু নিদারুণ সত্য কথা।

সেই রাজনৈতিক কারণের অনুসন্ধানে এ গ্রন্থ লিখিনি। রবীন্দ্রকাব্যের মূল্যায়ন করতে বসেছি একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সেই দৃষ্টিভঙ্গিই মার্কসবাদ। মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন কয়েকজন করেছেন। কিন্তু সে মূল্যায়ন হয়েছে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই সাহিত্যিক বা কবি রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে নয়। রবীন্দ্র ব্যক্তিত্ব তাঁর কাব্য বা সাহিত্যিক প্রতিভার সঙ্গে অন্বিত। রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধ-বিরোধিতা বা সমকালীন রাজনৈতিক প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের উত্তর নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উপর মার্কসবাদীরা নিশ্চয়ই অনুকূল বা প্রতিকূল কিছু কথা বলেছেন। সেসব কথার কোনো গুরুত্ব নেই, এমন ভাবনা আমার নেই। কিন্তু মনে হয়েছে যে রবীন্দ্রকাব্য মানসের বিবর্তনের একটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে মার্কসবাদীরা অগ্রসর হননি। কী তাঁদের বাধা ছিল আমি তা বুঝিনি।

এই অভাববোধ থেকেই এ-গ্রন্থের পরিকল্পনা। কাজটা সহজ নয়। রবীন্দ্রকাব্যের বরেণ্য ও প্রতিষ্ঠিত সমালোচকরা রবীন্দ্রনাথকে যে আলোতে উপস্থাপিত করেছেন দীর্ঘকাল ধরে তা দৃঢ়ভাবে বাসা বেঁধেছে আমাদের মানসলোকে। মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রকাব্য বিচারের কথা বললেই অনেকে ক্ষুব্ধ হবেন, বেশির ভাগ হতচকিত হবেন।

মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁদের একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। সেই ধারণা থেকে তাঁরা খুব সহজেই সিদ্ধান্ত টানবেন এই বলে যে, এ-চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। মার্কসবাদ বড়ো জোর একটা রাজনৈতিক তত্ত্ব, আর রবীন্দ্রকাব্য হল বিশুদ্ধ শিল্পকর্ম। দু-এর অঙ্গন ভিন্ন। প্রস্তাবিত মূল্যায়ন বা চর্চা প্রকৃতপক্ষে চর্চা নয়, এ অনধিকার চর্চা। বলে রাখা ভালো সাম্প্রতিক চর্চা বিশুদ্ধ শিল্পচর্চা নয়। মার্কসবাদীরা বিশুদ্ধ শিল্পচর্চাকারী নন। তাঁরা সমাজবিপ্লবী। সমাজবিপ্লবী বলেই তাঁরা রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের সংগঠক। সমাজসত্তা হিসেবে সমাজবিপ্লবী শিল্পচর্চার উপর নতুন কিছু আলোক সম্পাত করতে পারেন। শিল্পকর্মের অনেক দিগন্ত কেবল সমাজবিপ্লবীর চোখেই পড়ে, অন্যদের চোখে নয়। বিশুদ্ধ শিল্পকর্মী বা সমালোচকরা উন্মোচিত সেসব দিগন্ত থেকে কিছু সমৃদ্ধ হতে পারেন।

বাহুল্য হলেও বলতে হয় বিশুদ্ধ শিল্প চর্চাকারদের সম্ভাব্য কিছু উপকারের জন্য এ-বই লেখা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য কীর্তিও এখানে আলোচিত নয়। আলোচ্য কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিতা—রবীন্দ্রকবিমানসের বিবর্তনই এখানে রেখায়িত। কবির কয়েকখানা কাব্যগ্রন্থের কোনো উল্লেখ নেই। উল্লেখিত কাব্যগ্রন্থের সব কবিতাও আলোচ্য নয়। নিরাসক্ত মনে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পরিচয় দেওয়া আমার লক্ষ্য নয়। সে কাজ যাঁরা করেছেন তাঁরা শ্রদ্ধেয়। কিন্তু এই গ্রন্থ-পরিকল্পনায় আমার ছিল একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। সেটা আমি আদৌ গোপন করতে চাইনি। উদ্দেশ্যের প্রয়োজনে আমাকে নির্বাচন করতে হয়েছে। কিছু গ্রহণ করেছি, অনেক কিছুই বাদ পড়েছে। বাদ যা কিছু পড়েছে তা সবই সামান্য নয়। তার অনেকই অসামান্য। কিন্তু সীমিত পরিকল্পনায় অসামান্য সেসব কবিতা আমাকে বাদ দিতে হয়েছে। এমনও হতে পারে যে তাদের কোনো কোনোটা আমার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করত। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ কাব্যজীবন ধরতে চেয়েছি, কিন্তু নির্দিষ্ট দৃষ্টিতেও যা ধরেছি সেটা পূর্ণ হয়েছে, এমন কথা বলবার দুঃসাহস আমার নেই।

মূল উদ্দেশ্য অনুসরণ করতে গিয়ে আর একটা উদ্দেশ্য কিছু সাধন করতে চেয়েছি। মার্কসবাদ অনড় ব্যবস্থা নয়। মার্কসবাদ একটা দৃষ্টি। এ-দৃষ্টি রূপ দিতে গিয়ে রূপকাররা যে ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছেন তা শিলীভূত বা স্ব-সম্পূর্ণ নয়। এ-দৃষ্টি সম্প্রসারণশীল, তার ব্যবস্থাও নতুন নতুন বাতাবরণে সমৃদ্ধিশীল হয়েছে, আরও হবে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দৃষ্টি মার্কসবাদে অন্বিত হতে পারে। তার কিছু আভাস দেবার চেষ্টা করেছি। সফল কতটা হয়েছি সেটা মার্কসবাদী পাঠকের বিচার্য।

গ্রন্থ প্রণয়নে আমি কয়েকজনের কাছে ঋণী। তাঁরা হলেন ৺গৌরীচরণ ভট্টাচার্য, ৺বিমল চক্রবর্তী ও শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা শিক্ষাবিদ, লেখক-কবি, সর্বোপরি, দীর্ঘকালের রাজনৈতিক কর্মী বা চিন্তাবিদ। তাঁদের উৎসাহেই এ গ্রন্থ রচনা শেষ করতে পেরেছি। কৃতজ্ঞ চিত্তে সে ঋণ আমি স্বীকার করি। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমি সমৃদ্ধ হয়েছি। কিন্তু গ্রন্থে ব্যক্ত কোনো অভিমতে বা বিবৃত কোনো তথ্যে তাঁদের কিছুমাত্র দায়িত্ব নেই।

বইমেলা ২০১৩ সত্যেন্দ্রনাথ সাহা

মার্কসবাদী শিল্পদৃষ্টি

মার্কসবাদীদের একটা বিশ্বদৃষ্টি আছে। এই বিশ্বদৃষ্টি দিয়ে তাঁরা জীবন ও জগৎকে দেখেন। ঐ দেখার মধ্য দিয়েই তাঁরা জীবনের লক্ষ্য স্থির করেন, সে লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ নির্দেশ করেন। তাঁদের জীবনচর্চা ও জীবনচর্যা সেই বিশ্বদৃষ্টিরই অনুগামী। ইংরেজিতে আমরা যাকে eclecticism বলি, মার্কসবাদীরা তার ঘোর বিরোধী। জীবনকে মার্কসবাদীরা খণ্ড খণ্ড করে দেখতে চান না। খণ্ডিত দৃষ্টি বা নানা বিষম মতের কোন গরমিলের সঙ্গে তাঁরা কিছুতেই আপোষ করবেন না। এই কারণে মাঝে মাঝে তাঁদের এমন অভিযোগ শুনতে হয় যে তাঁরা মতান্ধ।

মার্কসবাদী বিশ্বদৃষ্টির ভিত্তিতে সমকালীন বিশ্বে গড়ে উঠেছে এক প্রবল গণ আন্দোলন। মার্কসবাদের প্রবক্তা কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস—দুজনেই জন্মসূত্রে জার্মান, কিন্তু কর্মসূত্রে ইউরোপীয়, দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবিক। মার্কসবাদের অনুগামীদের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। জন্মলগ্নে মার্কসবাদকে অনেকেই উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ। মার্কসবাদের প্রবল বিরোধীরাও মার্কসবাদকে স্বীকার না করে আর পারছেন না। আন্দোলনের ক্রম প্রসারে, অনুগামীদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে যা স্বভাবত হয়ে থাকে তাই হয়েছে। মার্কসবাদের নানা ব্যাখ্যা হয়েছে। তার প্রয়োগে বিভিন্নতা গোটা বিশ্বে। মার্কসবাদের বিরোধীপক্ষও সমালোচনার প্রয়োজনে মার্কসবাদকে উপস্থাপিত করেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। বলা বাহুল্য, উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অভিসন্ধিমূলকভাবে মার্কসবাদকে কখনও কখনও বিকৃতও করা হয়েছে। ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যায় মার্কসবাদ যতখানি স্পষ্ট হয়েছে তার থেকে অস্পষ্ট হয়েছে অনেক বেশি। ধোঁয়া জমেছে বিস্তর। সেই অস্পষ্টতা দূর করে অভ্রান্তভাবে মার্কসবাদী দৃষ্টি উপস্থাপনা করবার দাবি বর্তমান লেখক করছে না। কিন্তু আলোচ্যবিষয়ের ভূমিকাতে সেই দৃষ্টি সম্পর্কে কিছু না বললেও চলে না। যা বলা হচ্ছে সেইটেই সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টি কিনা সে বিচারের ভার পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে।

মার্কস পরাবিদ্যাবিদ নন। তিনি হলেন সমাজদার্শনিক, তাঁর লক্ষ্য মানব ইতিহাসের ব্যাখ্যা। সুতরাং তাঁর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষ, সামাজিক মানুষ (Social being)। মানুষকে তিনি দেখেছেন সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবে। মনে হতে পারে মার্কস বুঝি

অ্যারিস্টটলের সমধর্মী। গ্রিক দার্শনিক মানুষকে দেখেছিলেন রাষ্ট্রনৈতিক জীব হিসেবে। তাঁরই প্রখ্যাত উক্তি Man is a political animal, প্রসঙ্গক্রমে স্মর্তব্য যে মার্কস অ্যারিস্টটলকে বলেছেন প্রাচীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ—The greatest thinker of the antiquity।

রাষ্ট্রনৈতিক সত্তা হিসেবে মানুষকে দেখার মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে। মার্কস এই ত্রুটি চিহ্নিত করেছিলেন হেগেলের সমাজদর্শনের সমালোচনায়। মানবজীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে হেগেলের বক্তব্য খণ্ডন করে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন পৌর সমাজকে (Civil Society)। হেগেলের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্ব হল রাষ্ট্রের। এই অঙ্গনে হেগেল অ্যারিস্টটলের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেছেন। দুজনকেই সমালোচনা করে মার্কস সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন একটা বক্তব্য—মানুষ সামাজিক জীব। তাঁর কাছে মানুষের সমাজসত্তাই আদি, তার রাষ্ট্রনৈতিক সত্তা গৌণ। মানুষ নাগরিক, সে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সভ্য কিন্তু তার আগে তাকে বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে, তার জৈব অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। কারণ, মানুষ হল প্রাকৃত জীব। তার উৎপত্তি হয়েছে প্রকৃতি থেকে।

হেগেলের মতো ভাববাদী দার্শনিক মানুষের প্রাকৃত মূলকে মেনে নিতে পারেন না। মানুষের মূল যে প্রকৃতিতে প্রোথিত এই সত্য অস্বীকার করলে বিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করা হয়। প্রকৃতিবাদ বা বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তি হল এই বৈজ্ঞানিক সত্য বা মৌল তথ্য। প্রাকৃত এই মূল কারণের বাধ্যতাতেই মানুষকে বাঁচবার জন্য উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকতে হয়। এই প্রক্রিয়াই হল শ্রমপ্রক্রিয়া—প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চিরন্তন লেনদেন। চার্লস ডারউইনের মানব-প্রজাতির জন্মবৃত্তান্ত লেখবার অনেক আগেই জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম প্রক্রিয়ার কথা শুনিয়েছিলেন মার্কস। ডারউইন ও তাঁর অনুগামীরা প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে মাত্র জীবনযুদ্ধই দেখেছিলেন। কিন্তু জীবনের পুনরুৎপাদনে সমন্বয়ের দেখা পাননি। মার্কস সেই সমন্বয় দেখেছিলেন। উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে মানুষ সংঘবদ্ধ হয়, একে মেলে অপরের সঙ্গে। এই মিলনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। মানব সম্পর্কের এই জালই হল সমাজ। একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন—চুক্তি করে ব্যক্তি মানুষ অপর ব্যক্তির সঙ্গে মিলে সমাজ বা রাষ্ট্র গড়েনি, যেটা হবস, লক বা রুশো ভেবেছিলেন। আদিতেই মানুষ যূথবদ্ধ। বানর জাতীয় জীবদের আচরণ দেখলে আদি মানুষের অবস্থা অনুমান করা যাবে। মানুষ যেমন প্রাকৃত, মানুষের সমাজও তেমনি প্রাকৃত। প্রাকৃত মানুষই সমাজবদ্ধ। সমাজসত্তা প্রাকৃতসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, হতে পারে না। ঐ উত্তরাধিকারের সুবাদেই তারা ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হয়, নরনারী পরস্পরের আসঙ্গ কামনা করে, বংশবৃদ্ধি করে এবং শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মানুষ প্রাকৃতসত্তা, এই কথা বলেই মার্কস থেমে যাননি। এ কথা তাঁর আগে অনেকে শুনিয়েছেন, পরে আরও বেশি লোক শুনিয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যাঁরা প্রশ্নটা দেখেন তাঁরা অনৈতিহাসিক। জগৎ তাঁদের কাছে একটা নিশ্চল ব্যবস্থা। জগৎ গতিশীল, মানুষও গতিশীল। এটা আর একটা অখণ্ডনীয় তথ্য। প্রাকৃত মানুষ সমাজসত্তায় উত্তীর্ণ হয়ে ঐতিহাসিক সত্তায় পরিণত হয়েছে। মানুষের প্রাকৃতসত্তা ছাড়া আর কিছু যাঁরা দেখতে অস্বীকার করেন তাঁরা বিশ শতকের মানুষকে আদিম মানুষের অবিকল প্রতিরূপ বলে ফতোয়া দেন। ফ্রয়েডের অনুগামীরা সমাজ মানুষকে বন্দিপুরুষ হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। সভ্যতার ভূমিকা কেবল পেষণের ভূমিকা। মানুষের জৈব আশা আকাঙ্ক্ষাকে কৃত্রিম উপায়ে বেঁধে রাখার উপকরণই হল সভ্যতা। বিশ শতকের সভ্য মানুষ মূলত সেই আদিম মানুষ—এই কথাই বলতে চেয়েছেন ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামীরা।

প্রাকৃত মানুষ ব্যক্তি মানুষ, সমাজবদ্ধ মানুষ নয়। সে স্বার্থবাদী, সে কেবল চেনে নিজেকে। সমাজ তার স্বার্থ সাধনের একটা উপায় মাত্র, এ একটা কৃত্রিম সৃষ্টি। বহুদিন আগে ডানিয়েল ডিফো *রবিনসন ক্রুশো*র কাহিনি লিখে এক অভুতপূর্ব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। কাহিনির নায়ক ক্রুশো পরবর্তীকালে সমাজতত্ত্বের মডেল হয়ে উঠলেন। ডিফোর ক্রুশো একজন সৎ ধর্মভীরু খ্রিস্টান। জাহাজ ডুবি হবার আগে পর্যন্ত বহু ইংরেজের সঙ্গে সমাজ জীবনের স্বাদ ভোগ করেছিলেন ক্রুশো। তত্ত্ববিদের ক্রুশো সামাজিক নন। তিনি প্রাক-সমাজজীবনের প্রতিনিধি। এই সব তত্ত্ববিদ ভাবেননি যে প্রাক-সামাজিক ব্যক্তি প্রাক-মানব। যেদিন সে সামাজিক হয়ে ছিল সেদিনই সে হল মানবিক। প্রাক-সামাজিক ব্যক্তি-মানুষ একটা কল্পনার বিহঙ্গ।

এইজন্যেই মার্কস মানুষকে দেখেছেন সমাজসত্তা হিসেবে। এই কথা যখন বলা হচ্ছে তখন যেন ভুলে না যাই যে সমাজসত্তা প্রাকৃতসত্তার অস্বীকৃতি নয়। প্রাকৃত ভিত্তিতেই সমাজসত্তার উন্মেষ। সমাজসত্তা বিবর্তনশীল। মার্কস সমাজ বিবর্তনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এঙ্গেলস সেই বিবর্তনের বিবরণ দিয়েছেন। মার্কসবাদী দৃষ্টির স্ফটিকস্বচ্ছ বিবৃতি পাওয়া যাবে নীচের উদ্ধৃতাংশে—

In the social production of their life, men enter into definite relations that are indispensable and independent of their will, relations of production which correspond to a definite stage of development of their material productive forces. The sum total of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real foundation, on which rises a legal and political super structure and to which correspond definite forms of socical consciousness. The mode of production of material life conditions the social, political and intellectual life process in general. It is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary, their social being that

determines their consciousness. (Karl Marx : *Preface to a Contribution to the Critique of Political Economy.*)

উদ্ধৃতাংশের মধ্যে সমাজসত্তা ও সমাজচেতনার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা বক্তব্য রাখা হয়েছে। সমাজসত্তা প্রতিফলিত হয় সমাজচেতনায়। বৌদ্ধিক জীবন সমাজচেতনার অভিব্যক্তি। সমাজসত্তা হিসেবে মানুষ উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত। সেই মানুষই বিজ্ঞানের সাধনা করে, গান গায়, ছবি আঁকে, কবিতা লেখে।

ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর যে মানুষ সে প্রাকৃত মানুষ। যৌন সংসর্গে আসক্ত যে মানুষ সেও প্রাকৃত মানুষ। গান যে গায় সেও প্রাকৃত মানুষ। তার গান পাখির গানের মতোই জৈব। তার আদিম দেহভঙ্গিমায় আছে হরিণ শিশুর চাঞ্চল্য। কিন্তু এই পর্যন্তই প্রকৃতির দান। সামান্য এইটুকু প্রাকৃত উত্তরাধিকারের মধ্যে মানুষ সীমিত থাকেনি। প্রাকৃত বিশ্ব থেকে সমাজ বিশ্বে তার উত্তরণ উন্মোচন করে দিল সীমাহীন এক দিগন্ত। পাখি যেখানে থেমে গেছে, হরিণ শিশুর নৃত্য চাঞ্চল্যের সীমা যেখানে বাধা পড়ল, তারপর থেকেই শুরু হয়েছে মানুষের অবিরাম অগ্রগতি। সেইভাবেই ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ অননুকরণীয় ভঙ্গিতে—

পাখিরে দিয়েছে গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।

অগ্রগতির মূল হল সমাজসত্তায় মানুষের উত্তরণ। পাখির কণ্ঠস্বর নিয়ে, হরিণ শিশুর দেহভঙ্গিমার প্রাকৃত উত্তরাধিকার নিয়ে যাত্রা যার শুরু, সামাজিক শ্রমের প্রক্রিয়ায় সে যা পেল তাই বলেছেন এঙ্গেলস—

Labour, adaptation to ever new operations, the inheritance of muscles, ligaments, and over longer periods of time, bones that had undergone special development and the ever renewed employment of this inherited finesse in new, more and more complicated operations, have given the human hand the high degree of perfection required to conjure into being the pictures of a Raphael, the statues of a Thoravaldsen, the music of a Paganine. (F. Engels : *Dialectics of Nature*)

বলাই বাহুল্য, মানুষের এইটেই চরম পাওয়া নয়। তার প্রাপ্তি সম্প্রসারণশীল। সম্প্রসারণের উৎস কী? মার্কস তার উত্তর দিয়েছেন। বলছেন তিনি।

At a certain stage of this development, the material productive forces of society come in conflict with the existing relations of production, or

what is but a legal expression for the same thing—with the property relations within which they have been at work hitherto. From forms of development of the productive forces these relations turn into their fetters. Then begins an epoch of social revolution. (Karl Marx : *Preface to a Contribution to the Critique of Political Economy*)

ইতিহাসের চালিকা শক্তি কী, সেটা নির্দেশ করেছেন মার্কস। বিবর্তন কোনো কোনো সময় ঘটে দ্রুত তালে। দ্রুত পরিবর্তনের কালকেই বলা হয় বিপ্লব। বিপ্লবের বৈষয়িক ভিত্তিভূমি আছে। বিপ্লব পরিবর্তন আনে উৎপাদন পদ্ধতিতে। উৎপাদন পদ্ধতি একটা ঐক্য। দুটো দিকের একটা সংহতি। একটা দিক হল উৎপাদন শক্তি, অন্যটা উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদন শক্তি ক্রমোন্নয়নশীল। উৎপাদন সম্পর্ক নিশ্চল। সম্পর্কের এই স্থিতিশীলতার মূলে রয়েছে একটা সামাজিক ঘটনা—স্থিতস্বার্থের উদ্ভব। স্থিতস্বার্থ পরিবর্তন বিরোধী। ফলে সংঘাত অনিবার্য। ক্রমোন্নয়নশীল উৎপাদন শক্তির সঙ্গে বাধে সংঘাত অচল সামাজিক সম্পর্কের।

শ্রেণিসংগ্রাম ঐতিহাসিক ঘটনা। সংগ্রামে অস্ত্রশস্ত্র তো আছেই। কিন্তু তার থেকেও বড়ো ভূমিকা হল মতাদর্শের। শাসকশ্রেণি তার আধিপত্যের পক্ষে যুক্তি দেখাবেই, শাসিত শ্রেণি সে যুক্তি খণ্ডন করে সমাজ সম্পর্কের পুনর্গঠনের দাবিও তুলবে। মতাদর্শগত সংঘাতের মাধ্যমেই উন্মেষিত হয় নব নব ভাব-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তন-মনন। এই প্রক্রিয়াতেই উদ্ভূত হয় ধর্ম-দর্শন, ন্যায়-নীতি, আইনশাস্ত্র, শিল্প-সাহিত্য, ছবি গান। এক কথায় আমরা যাকে বলি মানব-সংস্কৃতি। মানব-সংস্কৃতি ব্যক্তি মানুষের সৃষ্টি। কিন্তু তার মূলে আছে সমাজ মানুষ, মানুষের সমাজসত্তা। সমাজসত্তা বিকশিত হয়। ব্যক্তি মানুষের বিকাশ সমাজসত্তা বিকাশের ফলশ্রুতি। সমাজসত্তার বিকাশে মানুষ শুধু র‍্যাফেলের চিত্রকলা লাভ করেনি। তার যা কিছু শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক প্রাপ্তি তার মূলে আছে বিকাশোন্মুখ সমাজসত্তা। সেই সমাজসত্তাই এককালে উৎপন্ন করেছিল গ্রিক মহাকাব্য। সমাজসত্তার বিকাশেই মানুষ লাভ করেছিল শেকসপিয়রের অমর নাট্যগুচ্ছ, বিটোফেনের সিম্ফনিপুঞ্জ। প্রাকৃত মানুষ মহাকাব্যের চিন্তাও মনে আনতে পারত না, শেকসপিয়রের নাটকের কথাও ভাবতে পারত না।

এতে কি কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে যে, শেকসপিয়রের নাটক সৃষ্টিতে যে সমাজসত্তা ক্রিয়াশীল তা গুণগতভাবেই গ্রিক নাটকের সমাজসত্তা থেকে আলাদা? গ্রিক মহাকাব্য উৎপন্ন করেছিল যে সমাজসত্তা সে আর আজ নেই। না থাকুক। কিন্তু গ্রিক মহাকাব্য আজও আমাদের রসপিপাসা পরিতৃপ্ত করে। এইজন্যই গ্রিক মহাকাব্য একটা কালজয়ী সৃষ্টি। তার আবেদন আজও অমলিন বলে কেউ যদি গ্রিক মহাকাব্যের অনুকরণে কিছু সৃষ্টি করেন তা কিন্তু আধুনিক মানুষের মনে কোন অনুকরণ তুলতে পারবে না। কোনো প্রথম শ্রেণির কবি বা নাট্যকার সে চেষ্টায় ব্রতী হবেন না। মধুসূদন সংস্কৃত রামায়ণের ঘটনা ও চরিত্রের উপর নির্ভর যে যে মহাকাব্য রচনা করেন তা ভাবে-ভঙ্গিতে আদর্শ